বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট এবং সম্ভাব্য সমাধান : নবায়নযোগ্য শক্তি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক পর্যালোচনা

মাহবুব সুমন

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের নামে সরকার যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তা বহুদিক থেকে বিপজ্জনক। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের সম্পদ বিবেচনায় সবচাইতে পরিবেশসম্মত, বাস্তবায়নযোগ্য, টেকসই ও সুলভে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী পথ দেখানো হয়েছে। নবায়নযোগ্য বিভিন্ন শক্তির যে সমাবেশ আছে বাংলাদেশে তা পরীক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্তমান মজুদ ও তার সম্ভাবনা এবং তার ভিত্তিতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পরিকল্পনা 'প্রস্তাব' আকারে এই লেখার দ্বিতীয় পর্বে দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বের বাকি অংশের মতো বাংলাদেশেও বিদ্যুৎসহ সকল এনার্জির চাহিদা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেশ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই (প্রতিবছর শতকরা ১০ ভাগ হারে) বেড়ে চলেছে। দেশে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য এনার্জির সংকট কিছুটা বাস্তব এবং বেশির ভাগটাই কৃত্রিম। বিদ্যুৎ খাতে তেমন কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো নির্মাণ না করেই পূর্বতন সরকার ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ায় ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মধ্য গ্রীষ্মের মোট ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে ১০০০ মেগাওয়াট ঘাটতি পূরণ করার জন্য স্বল্প মেয়াদী সমাধান হিসেবে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। দুই বছর পর (২০০৯ সালে) বর্তমান সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর বিদ্যুৎ সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে না যাওয়ায় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করে। কিন্তু বর্তমান সরকারও সে সময় কোনো টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে না গিয়ে ক্রমান্বয়ে কুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। পরবর্তী চার বছরে অনেক কিছু করার কথা থাকলেও অর্থনীতি সচল রাখার নামে ব্যক্তিমালিকানা, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির হাতে বিদ্যুৎ খাতকে সমর্পণ করা হয়। যার ফলে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদিত ৭৮১৭ মেগাওয়াটের ৪৭৫০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা তৈরি হয় মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যক্তিখাতে: আইপিপি, এসআইপিপি (২৬২৭ মেগাওয়াট) এবং রেন্টাল (২১২১ মেগাওয়াট) খাতে। অবশিষ্ট ৬১৮৯ মেগাওয়াট উৎপাদিত হয় সরকারি ব্যবস্থাপনায়। এ বছর (২০১৬) রেন্টাল খাতের অনুপাত আরও বাড়িয়ে ৫০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে ক্রমাগত বিদ্যুতের চাহিদা সমাধানের নামে অপরিকল্পিত উপায়ে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে একে দীর্ঘায়িতকরণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে নবায়নযোগ্য শক্তিকে চরম অবহেলার দৃষ্টিতে বিচার করা এবং গ্যাসক্ষেত্রে ন্যূনতম বিনিয়োগ অনুসন্ধান উত্তোলনে জাতীয় সংস্থার সক্ষমতা ও সুযোগ না বাড়িয়ে তাকে কোণঠাসা করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে যে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংকট তা ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি, কুইক রেন্টালের পরিমাণ দ্বিগুণ করা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কমবে তো না-ই, বরং বাড়বে। সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে না গিয়ে উচ্চমূল্যে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের এসব সমাধান অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বোঝা তৈরি করছে।

অথচ বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে গত দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভেতর দিয়েই প্রাকৃতিক গ্যাস ও নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌর, বায়ু, বর্জ্য) ব্যবহার করে দেশের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের সিংহভাগ লাঘব করা যেত। তার সাথে দীর্ঘ মেয়াদে ডেইরি, পোলট্রি, স্যুয়ারেজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করে ক্রমান্বয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে দেশের মোট চাহিদার সম্পূর্ণটুকুই সরবরাহ করা সম্ভব ছিলো। যখনই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো টেকসই সমাধানে যাওয়া হবে, তার প্রভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে গ্যাস ও তেলের অন্যান্য চাহিদা এবং সংকটগুলোও সমাধান হতে থাকবে। যে কারণে এই আলোচনার অনেক জায়গায়ই বিদ্যুতের সাথে প্রাসংগিকভাবেই গ্যাস ও তেলের বহুবিধ ব্যবহারের কার্যকর সমাধান প্রসঙ্গ এসেছে। দুই পর্বের এই লেখায় প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্তমান মজুদ ও তার সম্ভাবনা এবং ভিন্নভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রকৃত সম্ভাবনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে সেই সম্ভাবনার ভিত্তিতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে এবং সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পরিকল্পনা 'প্রস্তাব' আকারে এই লেখার দ্বিতীয় পর্বে দেওয়া হয়েছে।

সংকট সমাধানে নবায়নযোগ্য শক্তি: সম্ভাবনা

নবায়নযোগ্য শক্তি: সারা পৃথিবীর মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্পদশালী ও আশীর্বাদপূর্ণ। এখানে একই সাথে সৌর, বায়ু, বর্জ্য, নদীপ্রবাহ এবং অন্যান্য বায়োমাস ব্যাপক পরিমাণে আছে। খুব কম দেশে এতগুলো নবায়নযোগ্য শক্তি একত্রে এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশে নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে অবিশ্বাস্য পরিমাণের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সক্ষমতা দিনে দিনে বাড়ছে। দাম কমছে। ফলে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে উৎপাদন সম্ভব তা সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে আপেক্ষিক ব্যাপার। ২০০০ সালের দিকে যেসব ছাত্র নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে পড়াশোনা ও কাজ করেছে, তাদের হিসাবে তখনকার প্রযুক্তি অনুযায়ী এই সম্ভাবনা ছিল ১০০০০ মেগাওয়াট। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত বাস্তবতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভেতর এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এটা ঠিক যে নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে এই মুহূর্তেই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সমস্যার

সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। তবে প্রযুক্তি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে শিগগিরই সম্ভব হবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সৌরবিদ্যুৎ দিয়েই শুরু করা যাক।

সৌর: গত ৩০ বছরে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ সূর্যের আলো পড়েছে তার সাথে দেশের অভ্যন্তরে এবং উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গতিবেগের তথ্য বিশ্লেষণ করে NASA, ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরি (NREL) এবং Estimation of Solar Radiation from Cloud Cover data of Bangladesh প্রকাশিত একাধিক গবেষণাপত্রে সৌরসহ সকল নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎসহ সকল এনার্জি সমস্যার সমাধানের কথা নিশ্চিত করা হয়েছে।[১]

আর বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা না করে যা করা হয়েছে তা হলো–

১. সৌরবিদ্যুৎ খাতের সম্ভাবনা কম দেখিয়ে তাকে ক্রমাগত অজনপ্রিয় করা হয়েছে।

২. একে শুধুমাত্র অফ গ্রিড কিংবা খুব প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য ৫০/১০০ ওয়াটের সোলার হোম সিস্টেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে (সর্বমোট ১৩০ মেগাওয়াট)।

৩. ইডকল থেকে একটি গাইডলাইন থাকলেও কোনো ধরনের মনিটরিং না করে, নিম্নমানের পণ্য আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে, নিম্নমানের সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল, ব্যাটারি এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ যাচ্ছেতাই রকমে সরবরাহ করে বাজারকে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. এখন সরকারের এই ব্যর্থ সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্পকেই সৌরবিদ্যুতের উদাহরণ হিসেবে সকল আলোচনায় হাজির করা হয়।

অন্যদিকে বাতাসের শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেই একই অব্যবস্থাপনা, দীর্ঘসূত্রতা, বিদেশি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ব্যবসা করানোর চেষ্টায় এর প্রকৃত সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা হয়নি। যার ফলে রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় এই দুটি ক্ষেত্র থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের সমাধানের উপায় হিসেবে কোনো পরিকল্পনা তো হয়ইনি এবং সরকারি আলোচনাগুলোতেও এ বিষয় গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয় না। অথচ বাকি বিশ্ব এ দুই শক্তি ব্যবহার করে তাদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান করে চলেছে।

সৌরবিদ্যুৎ বিষয়ক কিছু মৌলিক ধারণার সাথে পরিচিত হলে পরবর্তী আলোচনা বুঝতে সুবিধা হবে। সৌরবিদ্যুতের সংযোগ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে–গ্রিড টাই ও অফ গ্রিড।

গ্রিড টাই ও অফ গ্রিড সোলার: গ্রিড টাই সংযোগে বাড়ি বা কল-কারখানার প্রধান বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রিডের সাথে সংযুক্ত থাকে, যেখানে বিদ্যুতের মূল সরবরাহটি সৌরবিদ্যুৎ থেকেই আসে। এ ব্যবস্থায় চাহিদার বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে তা ফিড ইন ট্যারিফ কাঠামোতে গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সৌরবিদ্যুতের সরবরাহ কমে গেলে (দিনের আলো কমে এলে) স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বাড়ি বা কল-কারখানার চাহিদা পূরণ করা হয়।

কিছু কিছু মিশ্র ব্যবস্থায় গ্রিড টাই সংযোগের সাথে ইমার্জেন্সি ব্যাকআপ হিসেবে বড়মাপের ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে। কখনো সৌর ও গ্রিড দুটিরই অভাব হলে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ চলে। আবার কিছু গ্রিড টাই ব্যবস্থায় সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে দিনের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে রাতে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ব্যাটারিতে জমা করে রাখা হয়। রাতে সেই ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ চলতে থাকে। এমন সময় যদি ব্যাটারিতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাহলে সেটা সংযুক্ত স্থানের প্রয়োজন মেটানোর পর ফিড ইন ট্যারিফ কাঠামোয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

অফ গ্রিড সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা গ্রিড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো একটি স্থাপনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। এতে ব্যাটারির সাহায্যে সোলার প্যানেল থেকে শক্তি সঞ্চয় করে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় কিংবা ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি এবং ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল: সৌরবিদ্যুতের কয়েক ধরনের প্রযুক্তি আছে, যেমন– ফ্ল্যাট ফটো ভোল্টাইক, কনসেনট্রেটেড ফটো ভোল্টাইক, সোলার থার্মাল। আমাদের দেশের জায়গা, আবহাওয়া এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় ফ্ল্যাট ফটো ভোল্টাইক, বিশেষ করে মনো ও পলি ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল বেশি প্রযোজ্য। সে কারণে আমাদের আলোচনা ফ্ল্যাট ফটো ভোল্টাইক–মনো ও পলি ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল দিয়েই সাজানো। প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে ফ্ল্যাট ফটো ভোল্টাইক বা ফ্ল্যাট সোলার প্যানেল কয়েক ধরনের হয়, যেমন–থিন ফিল্ম, মনো ক্রিস্টালাইন ও পলি ক্রিস্টালাইন, ডাই সিন্থেসাইজড, অরগানিক। এই আলোচনা মনো ও পলি ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ছক-১: মনো বনাম পলি

প্যানেল	যান্ত্রিক দক্ষতা	জায়গা/মেগাওয়াট (একর)	দাম (টাকা)/ওয়াট	স্থায়িত্ব (বছর)
মনো ক্রিস্টালাইন	২০% - ২২.৫%	২.২ - ২.৫	১৮০ - ২০০	২৫
পলি ক্রিস্টালাইন	১৪% - ১৬%	৩ - ৩.৫	১৩০ - ১৫০	২০
থিন ফিল্ম	১০% - ১২%	৬ - ৭	১০০	৮ - ১০

মনো ক্রিস্টালাইন প্যানেলের যান্ত্রিক দক্ষতা ও স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। এতে জায়গা তুলনামূলক কম লাগে। আমাদের মতো বেশি তাপমাত্রার দেশে মনো ক্রিস্টালাইন প্যানেলের কার্যক্ষমতা পলির চেয়ে অনেক ভালো। বেশি তাপমাত্রার কারণে যান্ত্রিক দক্ষতা ও স্থায়িত্ব কমার হার কম। কিন্তু বাজার সয়লাব হয়ে আছে ১২% থেকে ১৪% যান্ত্রিক দক্ষতার নিম্নমানের পলি ক্রিস্টালাইন প্যানেলে। সেগুলা দেখেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে কিছু হবে না।

কতক্ষণ কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে: বিপিডিবির ২০১৫ রিপোর্টে বলা আছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারি, বেসরকারি ও আমদানি মিলে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৪৫৮৩৬ গিগাওয়াট। গ্রিড টাই সোলারে দিনের কার্যকর আলো যতক্ষণ থাকে (৪-৫ ঘণ্টা) ততক্ষণ তার প্যানেল বছরে কমপক্ষে ২৭০ দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ফলে এই প্রায় ৪৬ হাজার গিগাওয়াটের একটা বড় অংশ গ্রিড টাই সোলার থেকে এখনই উৎপাদন করা যাবে।

এর বাইরে কেউ যদি চায় শতভাগ স্ট্যান্ড অ্যালোন, অফ গ্রিড সিস্টেম বসাতে, তা-ও সম্ভব। কিংবা কেউ যদি চায় দিনের যে ৪-৫ ঘণ্টা সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যায়, সেই সময়ের মধ্যে পরের ১৬-২০ ঘণ্টার বিদ্যুৎ জমা করে রাখতে; প্রয়োজনীয় পরিমাণে সৌর প্যানেল স্থাপন

এবং ব্যাটারিতে জমা করে রাখার মাধ্যমে সেটাও সম্ভব। মজার বিষয় হলো, প্রকৃতির শক্তি সংগ্রহ, ব্যবহার ও জমা করায় কোনো বাধা নেই। এটা তো আর সিটি কর্পোরেশনের পানির সরবরাহ নয় যে একজন অনেক বেশি পানি খরচ করে ফেললে অন্যজনের ভাগে কম পড়ে যাবে। সূর্যের শক্তি দিয়ে আমরা আগামী ২.৫ বিলিয়ন বছর নিশ্চিন্তে চলতে পারব। পুরো বিষয়টায় জরুরি হলো এনার্জি নেওয়ার মুখ অর্থাৎ প্যানেলের আকৃতি এবং এনার্জি জমা করার স্টোরেজ বা ব্যাটারি কত বড়।

স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং কন্ডিশন (STC): সারা দুনিয়ার সমস্ত সৌর প্যানেল তৈরি করা হয় Standard Testing Condition (STC)-এ। এটি হলো সোলার প্যানেলের কর্মক্ষমতা মাপার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ টেস্টিং কন্ডিশন, যে কন্ডিশনে একটি সোলার প্যানেলকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়, ১.৫ এয়ার মাসে প্রতি বর্গক্ষেত্রে ১০০০ ওয়াট আলো ফেলে পরীক্ষা করা হয়। দেখা হয় এই অবস্থায় ১০০০ ওয়াট আলো নিয়ে সোলার প্যানেলটি কত ওয়াট সরবরাহ করছে। এই আউটপুট ও ইনপুটের অনুপাতই হলো ওই সোলার প্যানেলের যান্ত্রিক দক্ষতা। যান্ত্রিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করে ওই সোলার প্যানেল দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে কী পরিমাণ জায়গা লাগবে।

STC অনুযায়ী এক বর্গমিটারে সারা দিনে শক্তি আসার কথা ১০০০ ওয়াট। যান্ত্রিক দক্ষতা ২২.৫% হলে প্রতি বর্গমিটার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ২২৫ ওয়াট। STC-তে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল তৈরি করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো জার্মানিতে প্রতি বর্গমিটারে সর্বোচ্চ সৌরশক্তি আসে স্টুটগার্টে, ৩৫০০ ওয়াট। জার্মানির বাকি সব এলাকায় সূর্য থেকে আসা শক্তির পরিমাণ আরো কম। অথচ আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বেশ কিছু জায়গায় ঋতুভেদে প্রতি বর্গমিটারে সর্বনিম্ন ৩৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫০০ ওয়াট পাই। এর অর্থ হলো প্রতি বর্গমিটার থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি ১৬৫০ ওয়াটের বেশি। এটা আমাদের জন্য এক বিশাল প্রাকৃতিক সুবিধা।

সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ: সৌরবিদ্যুৎ বাস্তবায়ন করতে গেলে জায়গার ব্যবস্থা করা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। জায়গার পরিমাণ নির্ভর করে আমরা কী ধরনের এবং কত দক্ষতার প্যানেল ব্যবহার করব তার ওপর। ২২.৫% যান্ত্রিক দক্ষতার মনো ক্রিস্টালাইন প্যানেল ব্যবহার করলে খোলা জায়গায় ১ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে জায়গা প্রয়োজন ২.২ থেকে ২.৫ একর আর পলিতে ৩ থেকে ৩.৫ একর। চীনের তৈরি কম যান্ত্রিক দক্ষতার প্যানেল দিয়েও যদি সৌরবিদ্যুৎ করা হয় তাহলে প্রতি ৪ একরে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। আমাদের দেশের আয়তন ১৫০০০০ বর্গকিলোমিটার। মোট আয়তনের শতকরা ১ ভাগ জায়গা (১৫০০ বর্গকিলোমিটার) যদি সৌরবিদ্যুতের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে সে জায়গায় ৯২৬২৫ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করা যাবে। অতটা আমাদের দরকারও নেই।

আগস্ট মাসের ৫ তারিখ (২০১৬) প্রথম আলো পত্রিকার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৬ বর্গকিলোমিটার জায়গা বাড়ছে। কাজের প্রয়োজনে সৌরবিদ্যুৎ কর্মীদের যেহেতু পুরো বাংলাদেশের আনাচকানাচ, চর, দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাঁরা জানেন যে এসব বেড়ে যাওয়া জায়গা ছাড়াও আমাদের দরকারের বিদ্যুৎটুকু সৌরশক্তি থেকে উৎপাদন করার জায়গা আছে। সেটা কৃষিজমি নষ্ট না করেই।

জায়গা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রতিটি জেলার ওপর আলাদা করে (কোটা ব্যবস্থায়) দায়িত্ব ন্যস্ত করা যেতে পারে। নাগরিকদের সাথে আলোচনা করে যেভাবে সুবিধা হয় প্রতিটি জেলা তার কোটার জায়গা বন্দোবস্ত করে দেবে। জেলাগুলো সরকারি-বেসরকারি ভবন, হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুল, মন্দির, গির্জা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক ভবন, পেট্রল পাম্প, রাস্তার পাশের যাত্রীছাউনির ছাদে, টিনের ঘরের চালে, নদীর পারে, রাস্তার দুই পাশের ফুটপাথের ওপর, ধানক্ষেতের আইলে, ছোট সেচ খালের ওপর কালভার্ট বানিয়ে তার ওপর জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে। তা ছাড়া সোলার শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন অব্যাহত রেখে কৃষিজমির ওপর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, যা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সোলার শেয়ারিং পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা অনেক সহজ।

ছক-২: বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক খরচ

উৎস	টাকা/ওয়াট
পারমাণবিক	২০০
কয়লা	১৫৫
তেল	১৫০
সৌর	১৩০
গ্যাস	১২০
বাতাস	১০০

সূত্র:
https://www.irena.org/documentdownloads/publications/re_technologies_cost_analysis-wind_power.pdf,
http://www.eia.gov/electricity/generatorcosts/

খরচের তুলনামূলক টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে গ্রিড টাই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের খরচ অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে কম। এই মুহূর্তে মনো ও পলি ক্রিস্টালাইন প্যানেলের দাম অন্য সব উৎস দিয়ে স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে কম, তবে এর দাম কয়লার সমান হলেও প্রতিবছরই এই দাম কমছে। সৌরবিদ্যুৎসহ সকল নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান সুবিধা হলো, এতে যে এনার্জি ব্যবহার করা হয় তা ফ্রি এবং কখনো শেষ হবে না। ফলে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে প্রাথমিক এককালীন বিনিয়োগের পর আর তেমন কোনো খরচ নেই। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অসুবিধা হলো, এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার পর সকল এনার্জি, যেমন– কয়লা, তেল, গ্যাস অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয় এবং মজুদ সীমিত বলে কিছুদিন পর পর এর মূল্য বেড়ে যায়। ফলে নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পে ব্যাক পিরিয়ড (বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের খরচ যে সময়ের মধ্যে উঠে আসে) শেষ হলে সেই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ক্রমাগত অধিক মূল্যে মৌলিক শক্তি সরবরাহ করতে হয় বলে ক্রমাগত এর দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

সোলার শেয়ারিং : বিদ্যুৎ কৃষির যৌথ খামার

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের মতো দেশে সৌরবিদ্যুৎ বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জায়গার ব্যবস্থা করা। কারণ আমাদের জনসংখ্যা পরিমাণে এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। এই বিশাল জনসংখ্যার খাদ্যের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দরকার। পর্যাপ্ত জায়গা আছে, তবু অনেকেই দেশের স্বচ্ছ ধারণার অভাবে পর্যাপ্ত জায়গা আছে–এই কথার সাথে একমত হতে পারে না। তাদের প্রধান চিন্তা, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে যদি আমাদের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়! অত্যন্ত যৌক্তিক দুশ্চিন্তা। বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা হলে সেই

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের কৃষিকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না করে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, সেটিই হবে উত্তম। নিচে কিছু বাস্তব উদাহরণসহ দেখানো হবে যে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করেই সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ সংকট সমাধান করা সম্ভব।

আকিরা নাগাশিমা নামের একজন জাপানি কৃষিবিদ সোলার শেয়ারিং নামের একটি নতুন ধারণা নিয়ে আসেন ২০০৪ সালে। তিনি দেখতে পান, উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ আলো বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আলো বাড়লেও সালোক সংশ্লেষণের মাত্রা আর বাড়ে না। সালোক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে আলোর এই মাত্রাকে বলা হয় লাইট স্যাচুরেশন পয়েন্ট। নাগাশিমা দেখতে পেলেন যে সূর্যের আলো অনেক বেশি পরিমাণে আসতে থাকলেও একটা পর্যায়ের পর তা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাড়তি কোনো ভূমিকা রাখছে না। উদ্ভিদ তার যতটুকু দরকার, ততটুকু সূর্যের আলো পেলেই সুস্থ-সবলভাবে বাড়তে পারছে। নাগাশিমা তখন একই জমিতে কৃষি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। এটিই পরবর্তীকালে সোলার শেয়ারিং নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ২০০৪ সালে আকিরা নাগাশিমা যখন এই ধারণা নিয়ে আসেন, তখনকার চেয়ে এখন বাজারে দ্বিগুণ ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল পাওয়া যায়। ফলে আকিরা নাগাশিমা এক একর জমিতে যতটুকু বিদ্যুৎ ও খাদ্য উৎপাদন করে দেখিয়েছিলেন, এখন খাদ্য উৎপাদন একই পরিমাণে হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তার দ্বিগুণ। নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় বিদ্যুৎ উৎপদনের পরিমাণ প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে বেড়েই চলছে। সোলার শেয়ারিং পদ্ধতিতে প্রতি ৫.২ একর (পলি ক্রিস্টালাইন প্যানেল দিয়ে) জায়গায় সমান্তরালভাবে কৃষি এবং এক মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। মনো ক্রিস্টালাইন প্যানেল দিয়ে এ ক্ষেত্রে জায়গা লাগবে আরো কম।

সোলার শেয়ারিং ফিল্ড টেস্ট, আকিরা নাগাশিমা, শিবা প্রিফেকচার

নাগাশিমার সোলার শেয়ারিং ধারণার ওপর ভিত্তি করে জাপানের মিনিস্ট্রি অব অ্যাগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ফিশারিজ (গঅঋঅ) কৃষিজমির ওপর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কিছু গাইডলাইন তৈরি করে দেয়। কারণ এর আগে খাদ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হবে বলে জাপানে কৃষিজমির ওপর সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। MAFA-র গাইডলাইন অনুযায়ী, কৃষিজমির ওপর সৌরবিদ্যুৎ করতে গেলে স্ট্রাকচার হতে হবে হালকা, শক্তিশালী এবং বড় ধরনের ঝড়, ভূমিকম্প প্রতিরোধে সক্ষম। এই ডিজাইনে প্রচুর জায়গা খোলা থাকে; ফলে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। উদ্ভিদ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো পায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি যাতে সহজে আনা-নেওয়া করা যায়, শেডের তলায় সেই পরিমাণ জায়গা রেখে ডিজাইন করা হয়। আকিরা নাগাশিমার করা গবেষণায় দেখা গেছে, কৃষিশস্যের ক্ষেত্রে ৩২% পর্যন্ত ছায়া পড়লেও গাছের সুস্থ-সবল বৃদ্ধি হয়। ফলে ডিজাইন করার সময় এমনভাবে প্যানেল স্থাপন করা হয়, যেন নিচের ফসলে কোনোভাবেই ৩২%-এর বেশি ছায়া না পড়ে। এই পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে জাপানসহ বেশ কয়েকটি দেশে বাদাম, আলু, গাজর, শসা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেবুজাতীয় ফলের চাষ হচ্ছে।

কাজুসাতসুরুমাই সোলার শেয়ারিং প্রজেক্ট, মাকতো তাকাজাওয়া

নাগাশিমার এই নতুন ধারণার কারণে জাপানের কৃষকরা তাদের ফার্ম ল্যান্ডে একই সাথে শস্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ফিড ইন ট্যারিফ কাঠামোয় জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারে। যার ফলে প্রতি বর্গমিটার জায়গার উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়ে গেছে।

একই পদ্ধতিতে সৌরবিদ্যুতের নিচে গবাদি পশুর খামার, মাছের খামারও করা সম্ভব। ফ্রান্সে মাছের খামারে শিকারি পাখির হাত থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য পরিক্ষামূলকভাবে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পর দেখা গেল, এটি একই সাথে মাছ রক্ষা করছে, আবার গ্রিডে প্রচুর বিদ্যুৎও সরবরাহ করছে। অন্যদিকে জার্মানি ও ইংল্যান্ডের খামারিরা গবাদি পশুর খামারের সাথেও সৌরবিদ্যুৎ করছে, যা তাদের আয় বাড়তে সাহায্য করেছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও জমির উৎপাদনশীলতা প্রায় দ্বিগুণ করেছে।[২]

বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা

বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শত শত বছর ধরে নাবিকরা দেশ-বিদেশে বাণিজ্যিক জাহাজ চালিয়েছে। বাতাসের দিক ও গতি সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই নাবিকরা জানত। বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন আমরাও জানি। বিশ্বে কয়েক রকমের বাতাস আছে, যেগুলোকে গ্লোবাল উইন্ড আর লোকাল উইন্ড– এ দুই নামে প্রকাশ করা হয়। গ্লোবাল উইন্ডের মধ্যে আছে ট্রেড উইন্ড, যা বিষুবরেখার ওপর দিয়ে তার আশপাশে প্রবাহিত হয়। আছে ওয়েস্টারলিস ও পোলার জেট। এর বাইরে স্থানীয় মাটির গঠন, পানি, গাছপালার ধরনের ওপর নির্ভর করে যে বাতাস তৈরি হয় সেগুলাকে বলা হয় লোকাল উইন্ড।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন এক অবস্থানে আছে যে, এখানে ভালোভাবেই ট্রেড উইন্ড কাজ করার কথা ছিল। বিভিন্ন কারণে ট্রেড উইন্ড পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যতটা শক্তিশালী, এখানে ততটা নয়। কিছু কিছু জায়গায় বছরজুড়েই লোকাল উইন্ড থাকে। গত এক দশকে বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনার সাথে তা বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় এলাকার অনেক জায়গায় বাতাসের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।

বাতাসের গতি আমাদের দেশে কম ঠিকই, কিন্তু সেই কম গতি দিয়েও এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কুতুবদিয়ায় ১ মেগাওয়াটের স্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছে। আরো ১ মেগাওয়াটের কাজ শিগগিরই

সোলার শেয়ারিং ফিল্ড টেস্ট, আকিরা নাগাশিমা, শিবা প্রিফেকচার

শেষ হবে। সরকারি উদ্যোগে ৬০ ও ১০০ মেগাওয়াটের দুটি বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলছে। পাশাপাশি পরিচিত অনেক ব্যক্তি ও উদ্যোক্তা সম্ভাবনার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিজেরাও উইন্ড টারবাইন বানাচ্ছে।

বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মৌলিক কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। যেমন–

১. বর্তমান প্রযুক্তি অনুযায়ী কাট ইন স্পিড এবং খরচ কত।
২. বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের গতি কত।
৩. ক্রস উইন্ড আছে কি না।
৪. প্লান্ট ফ্যাক্টর কত হবে।
৫. সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ।

কাট ইন স্পিড এবং খরচ : বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়েক বছর আগের প্রযুক্তিতে কাট ইন স্পিড (প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন গতিবেগ) ছিল ৩.৫ মিটার/সেকেন্ড, এখন কাট ইন স্পিড ২.৪ মিটার/সেকেন্ড। অর্থাৎ ৩.৫ মিটার/সেকেন্ডের চেয়ে বেশি গতির বাতাস হলেই সেই বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। অন্যদিকে টাওয়ারের উচ্চতা বাড়ালে বাতাসের গতি ও ধরন পরিবর্তিত হয়। তবে টাওয়ারের উচ্চতা যত বাড়বে, নির্মাণ খরচও তত বাড়বে। তা সত্ত্বেও বাতাস থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে খরচ ওয়াটপ্রতি ১৫০ টাকার মতো।

বাতাসের গতি: বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বাতাসের গতিবেগ কত। আমাদের দেশে বাতাসের ধরন ও গতির বিস্তারিত ম্যাপিং না হলেও কয়েকটি জায়গায় ৫০ মিটার উঁচুতে বাতাসের গতিবেগ মেপে দেখা হয়েছে, যা ছক-৩ এ দেওয়া হলো। বাতাসের প্রাপ্ত এই গতিবেগ নিয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে এই গতিবেগ যথেষ্ট নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি আরো উঁচুতে উঠি তাহলে বাতাসের গতিবেগ আরো বেড়ে যায়, যা পরবর্তী ১০০ মিটারের টেবিলে(ছক-৪) দেওয়া হলো।

লুডভিগ প্রানডেলের করা এরোডায়নামিকস তত্ত্ব অনুসরণ করে ৫০ মিটার উচ্চতার বাতাসের ডাটাকে ভিত্তি ধরে আমরা চাইলে ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ মিটারের ডাটা তৈরি করতে পারি। নিচে ১০০ মিটার উচ্চতার সে রকম একটি চার্ট তৈরি করা হলো। এই চার্ট সাম্প্রতিককালে তেরি করা প্যান এসিয়া, রিজেন পাওয়ারের (২০১৪, ২০১৫, ২০১৬) উইন্ড ম্যাপিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফিল্ড ডাটার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে দেখানো বাতাসের গতির চেয়ে বেশি গতি পাওয়া গেছে।

ক্রস উইন্ড: যেসব জায়গায় উইন্ড ম্যাপিং করা হয়েছে, দেখা গেছে সেসব জায়গায় ক্রস উইন্ড অর্থাৎ দুই দিক থেকে বাতাস এসে টারবাইন জ্যাম করে ফেলে। হঠাৎ বাতাস কমে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া এবং বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যাও আছে। যার কারণে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ওঠানামা করে। ফলে গ্রাহক প্রান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ টারবাইন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করে রাখতে হবে। এসব টারবাইন বিচ্ছিন্নভাবে একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে, আবার সব টারবাইনের উৎপাদিত বিদ্যুৎ একত্রে গ্রিডেও সরবরাহ করা যেতে পারে।

প্লান্ট ফ্যাক্টর: যে কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে হলে প্লান্ট ফ্যাক্টর জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লান্ট ফ্যাক্টর হলো একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তার উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী সারা বছরে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার শতকরা হার। বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগের সাথে এর সম্পর্ক আছে। ওপরের দুই ছকের তথ্য ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় গতির বাতাস আমাদের আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় বছরের বিভিন্ন সময়ে বাতাসের গতিবেগ ৬ থেকে ১১ মিটার/সেকেন্ড, যা বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। সব মিলে বেশি বাতাসের

ছক-৩: ৫০ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গতিবেগ

স্থান/মাস	মুহুরী বাঁধ	মগনামা ঘাট	পার্কি সৈকত	কুয়াকাটা
	ফেনী	কক্সবাজার	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	পটুয়াখালী
জানুয়ারি	৫.১০	৫.৩০	৪.৯০	৫.৮০
ফেব্রুয়ারি	৫.৩০	৪.৮০	৫.১০	৫.৫০
মার্চ	৭.০০	৭.৩০	৭.৬০	৭.৭০
এপ্রিল	৭.৭০	৭.৯০	৭.৮০	৮.৩০
মে	৮.১০	৮.২০	৮.২০	৭.৯০
জুন	৭.২০	৮.০০	৭.৬০	৬.৯০
জুলাই	৭.৪০	৮.৪০	৮.১০	৭.৭০
আগস্ট	৬.৮০	৭.৭০	৭.৪০	৭.৫০
সেপ্টেম্বর	৬.৭০	৭.১০	৬.৯০	৬.৯০
অক্টোবর	৬.২০	৬.৮০	৬.৪০	৬.৩০
নভেম্বর	৫.৬	৫.৯০	৫.৬০	৫.৫০
ডিসেম্বর	৪.৯০	৫.৪০	৫.১০	৪.৮০

সূত্র: Prospects of Wind Energy in the Coastal Region of Bangladesh Nazia Farha, Md.Nur-Us-Safa, B.D Rahamatullah, Md.Sekendar Ali. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 8, August-2012 1 ISSN 2229-551

ছক-৪: ১০০ মিটার উচ্চতায় বাতাসের গতিবেগ

স্থান/মাস	মুহুরী বাঁধ	মগনামা ঘাট	পার্কি সৈকত	কুয়াকাটা
	ফেনী	কক্সবাজার	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	পটুয়াখালী
জানুয়ারি	৫.৮৩	৬.০৬	৬.০০	৬.০০
ফেব্রুয়ারি	৬.০৬	৫.৪৯	৫.৮৩	৬.৬৭
মার্চ	৮.০০	৮.৩৫	৮.৬৯	৯.৯৪
এপ্রিল	৮.৮১	৯.০৩	৮.৯২	১০.২০
মে	৯.২৬	৯.৩৮	৯.৩৮	১০.৭৩
জুন	৮.২৩	৯.১৫	৮.৬৯	৯.৯৪
জুলাই	৮.৪৬	৯.৬১	৯.২৬	১০.৬০
আগস্ট	৭.৭৮	৮.৮১	৮.৪৬	৯.৬৭
সেপ্টেম্বর	৭.৬৬	৮.১২	৭.৮৯	৯.০২
অক্টোবর	৭.০৯	৭.৭৮	৭.৩২	৮.৩৭
নভেম্বর	৫.৬	৫.৯০	৫.৬০	৫.৫০
ডিসেম্বর	৪.৯০	৫.৪০	৫.১০	৪.৮০

দেশগুলোতে যেখানে প্লান্ট ফ্যাক্টর ২১% থেকে ২৪%, সেখানে আমাদের দেশের প্লান্ট ফ্যাক্টর পাওয়া গেছে ১৬% থেকে ১৯%। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চিন্তা না করে যদি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে এই শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো যায় তাহলে আমাদের দেশে রক্ষণশীল হিসেবেও ৫০০০ মেগাওয়াটের বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

কিছু বাধা তার পরও আছে: যে কোনো উৎস থেকে গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার জন্য উৎপাদন আর ব্যবহারের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। যদি গ্রাহক চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি হয় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে, আর গ্রাহক চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম হলে গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে। উইন্ড টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় বাতাসের গতি ওঠানামা করলে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণও সেভাবে ওঠানামা করবে। গ্রিডের মোট বিদ্যুতের তুলনায় উইন্ড টারবাইন থেকে আসা বিদ্যুতের পরিমাণ সামান্য হলে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু পরিমাণে বেশি হলে এই তারতম্যের কারণে গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি ওঠানামা করবে। ফ্রিকোয়েন্সি তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুব সফলভাবে উন্নত দেশগুলো অ্যাকটিভ পাওয়ার কন্ট্রোল (APC) প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে তেমন কোনো জটিল সমস্যা ছাড়াই ইউরোপ ও আমেরিকার উইন্ড ফার্মগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যাচ্ছে।[৩]

কিছু কিছু দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের একটা বিশাল অংশ বাতাস থেকে আসে। যেমন ২০১০ সালে ডেনমার্কে ২১%, পর্তুগালে ১৮%, স্পেনে ১৬% এবং জার্মানিতে মোট বিদ্যুতের ৯% সরবরাহ হয়েছিল বাতাস থেকে। এখানে খেয়াল রাখা দরকার, উল্লিখিত পরিমাণগুলো বার্ষিক গড়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বাতাস থেকে সরবরাহ করা বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। ২০১১ সালে স্পেনের গ্রিডে বাতাস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের তাৎক্ষণিক পেনিট্রেশন ৫৯.৬% পর্যন্ত উঠেছিল। সেখানেও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ফ্রিকোয়েন্সির ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। ফলে এটি আমাদের জন্যও তেমন কোনো সমস্যা নয়।

সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ: উইন্ড টারবাইন বা বড় ধরনের উইন্ড ফার্ম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যাঁরা কাজ করছেন, যেমন–বাংলাদেশে বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রদূত প্রকৌশলী ফজলুর রহমান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে বাতাস আছে তা থেকে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।' প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গতি আমাদের চেয়ে বেশি নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের উইন্ড প্রোফাইল হুবহু এক। সেই একই উইন্ড প্রোফাইল নিয়ে ভারতের বায়ুবিদ্যুৎ স্থাপনা এই মুহূর্তে ২৩ হাজার মেগাওয়াট।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ

মানুষ বেড়ে চলেছে, তার সাথে বাড়ছে নগর। শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ নগরের বাসিন্দা। আমরাও ক্রমান্বয়ে সেদিকেই যাচ্ছি। নগরের মানুষ চাষবাস, খামার–এসব করে না। এখানে শিল্পায়ন, সেবা খাত, পাইকারি আর খুচরা বাজারকে আশ্রয় করে অল্প জায়গায় অনেক বেশি মানুষের বাস। এই নগরগুলোই সারা বিশ্বের রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, বিনোদন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্র। এর কোনো বিকল্প নেই। ফলে নগর এবং এর বাসিন্দা বাড়তেই থাকবে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৮০% মানুষ বাস করবে শহরে।

নগরে অল্প জায়গায় বিশাল জনগোষ্ঠী প্রতিদিন হাজার হাজার টন বর্জ্য তৈরি করে। সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে এসব বর্জ্য নগরের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশ নষ্ট করে, দুর্গন্ধ এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়, নালা-নর্দমা সব বন্ধ করে ফেলে। ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। বর্জ্যের স্তূপ থেকে চোয়ানো পানি আশপাশের নদী-খালে মিশে গিয়ে সেগুলোকেও দূষিত করে ফেলে। সারা নগরের বর্জ্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় জমা করা হলেও অনেক বিপদ। জমা বর্জ্য নগরের পরিবেশ দূষণ করার পাশাপাশি প্রতিবছরই বাড়তি জায়গা দখল করতে থাকে। ফলে টেকসই নগর নির্মাণের স্বার্থে বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটি নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখা যেতে পারে। তাতে নাগরিক, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মীসহ সকলের চিন্তা-বুদ্ধির সমন্বয় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। আমাদের উদ্দেশ্য নগরের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে বর্জ্যকে এমন কিছু পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে যাওয়া, যার মাধ্যমে বর্জ্য শুধুই বর্জ্য না থেকে সম্পদে পরিণত হবে।

নগর বর্জ্যের বর্তমান অবস্থা ও পরিমাণ

শুরুতে দেখা যাক আমাদের শহরাঞ্চলে কী পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট কনসার্নের করা এক জরিপ থেকে দেখা যায়, আমাদের দেশের বিভিন্ন শহরে প্রতিদিন প্রায় ১৩ হাজার টন বর্জ্য তৈরি হয়। সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকলে এসব বর্জ্য থেকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একই সাথে জৈব সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদনের অনেক উপকারের মধ্যে একটি হলো সার উৎপাদনে যে বিশাল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস লাগে তা বেঁচে যাওয়া। প্রকারান্তরে সেই গ্যাস আবার বিদ্যুৎ উৎপাদনেই ব্যবহার করা যায় এবং দেশের গ্যাস সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

জৈব সারের কাঁচামাল এবং উৎপাদিত জৈব সার

উন্নয়নশীল প্রায় সব দেশে নগর বর্জ্যের ৬৫%-এর বেশি জৈব বর্জ্য। বর্জ্য সংগ্রহের সময় নাগরিকদের ভিন্ন ভিন্ন পাত্র সরবরাহ করা হলে জৈব ও অজৈব বর্জ্য খুব সহজেই পৃথক করা যায় এবং পরে এসব জৈব বর্জ্যকে এরোবিক ডাইজেশন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে খুব সহজেই জৈব সার তৈরি করা যায়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন: ছক-৬ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের বর্জ্যে জলীয় অংশ খুব বেশি। আবহাওয়া, অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা–সব মিলিয়ে বেশির ভাগ নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের বর্জ্যে জলীয় অংশ অনেক বেশি থাকে। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে একে শুষ্ক করে যথাযথ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রতি কেজিতে এর ক্যালরিফিক ভ্যালু (তাপ মান) ১৫০০ কিলোক্যালরি হতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ক্যালরিফিক ভ্যালু প্রতি কেজিতে মাত্র ৬০০ কিলোক্যালরি। এই সমস্যা দূর করার জন্য বর্জ্য সংগ্রহের সময় থেকেই প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন বর্জ্য আলাদা করা হলে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (শুষ্ককরণ) জলীয় অংশ ৩০% কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব, এতে প্রতি ১০ হাজার টন (৪০% জৈব বর্জ্য) বর্জ্য থেকে ইনসিনারেশন প্লান্টের মাধ্যমে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পর মোট বর্জ্য পুড়ে আয়তনে ৯৬% কমে যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তুলনামূলক কম জায়গা লাগে। এভাবে শুরুতে যে বর্জ্য শুধুই পরিবেশ দূষণকারী ছিল তা সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা গেলে সব দিক থেকেই লাভজনক সম্পদে পরিণত হয়।

নবায়নযোগ্য গ্যাস

আমাদের আছে নবায়নযোগ্য উৎস ডেইরি, পোলট্রি, স্যুয়ারেজের বর্জ্য থেকে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা। সম্প্রতি (২০১৫-১৬) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ডিপার্টমেন্ট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড

ছক-৫: দেশের বিভিন্ন শহরে উৎপাদিত বর্জ্য ও বর্জ্য জমানোর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ

শহর	টন/দিন	বর্জ্য সংগ্রহের হার %	বর্জ্য জমানোর জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ (একর)	
			বর্তমান হারে	শতভাগ দক্ষতায়
ঢাকা	৪৩৩৪.৫২	৬০	৩৯.৮৯	৯৪.৯৭
চট্টগ্রাম	১৫৪৮.০৯	৭০	২২.২১	৩১.৭২
রাজশাহী	১৭২.৮৩	৫৬.৬৭	২.০১	৩.৫৪
খুলনা	৩২১.২৬	৪৭.৭	৩.১৪	৬.৫৮
বরিশাল	১৩৪.৩৮	৪৪.৩	১.২২	২.৭৫
সিলেট	১৪২.৭৬	৭৬.৪৭	২.২৪	২.৯৩
পৌরসভা	৪৬৭৮.৪	৫৪.৪২	৫২.১৭	৯৫.৮৭
অন্যান্য	১৭০০.৬৫	৫২	১৮.১২	৩৪.৮৫
মোট	১৩০৩২.৯		১৪১	২৭৩.২১

সূত্র: Waste Database by Waste Concern 2009

ছক-৬: আমাদের দেশে বর্জ্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

বর্জ্যের ধরন	পরিমাণ
খাদ্য ও সবজি	৬৮%
কাগজ	৯.৭৩%
পাস্টিক, চামড়া, রাবার	৫%
ধাতু	০.২৬%
কাচ ও সিরামিক	১%
কাঠ, ঘাস ও লতাপাতা	৪%
কাপড় ও পাটজাত	২%
ওষুধ ও রাসায়নিক	১%
কঙ্কর ও অন্যান্য আবর্জনা	৯%

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৌশলী বি ডি রহমতুল্লাহর নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সেখানে দেখা যায়, আমাদের দেশে গরু-মহিষের গোবর থেকে বছরে ১০৫ বিলিয়ন ঘনফুট, পোলট্রি ও স্যুয়ারেজ বর্জ্য থেকে ৫০ বিলিয়ন ঘনফুট, মোট ১৫৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব, যা দিয়ে দিনের হিসাবে সারা দেশ ৪৫ থেকে ৫০ দিন চলতে পারে।

গ্যাস উৎপাদন এবং তা গ্যাস গ্রিডে প্রেরণ: আমাদের দরকার ইউরোপের মতো দেশজুড়ে এসব বর্জ্য সংগ্রহের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার নির্মাণ। পরে এসব স্থাপনা থেকে গ্যাস তৈরি হলে তা গ্যাসের জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার ব্যবস্থাও দরকার। এই পদ্ধতিতে সারা ইউরোপ ও থাইল্যান্ডে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করে গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ বছর আগে থাইল্যান্ড এই প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপাদন করে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ শুরু করে। সম্প্রতি থাইল্যান্ড মিয়ানমারের কাছ থেকে গ্যাস আমদানি করছে। তার আগে পর্যন্ত থাইল্যান্ডের বিদ্যুতের প্রায় ৮০% উৎপাদন হতো নবায়নযোগ্য গ্যাস থেকে। এসব উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদনের পর যে সলিড বর্জ্য থেকে যায় সেগুলোর সাথে তারা কাঠের গুঁড়া আর ব্যবহৃত পোড়া তেল মিশিয়ে ফুয়েল কেক বানায়, যা আবার স্থানীয় বাজারে জ্বালানি হিসেবে বিক্রি হয়। আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য এই তিনটি উৎস থেকে যে পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব, তা দিয়ে বর্তমান চাহিদার শতকরা ১৫ ভাগ মেটানো যাবে, যা প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট মজুদকে আরো দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত এই গ্যাস দেশের বর্তমান চাহিদার প্রায় ১৪%। নবায়নযোগ্য হওয়ায় গ্যাসের এই সরবরাহ কখনোই শেষ হবে না; বরং প্রতিবছরই বাড়তে থাকবে। এই গ্যাস যদি মূল গ্রিডে সরবরাহ করা হয় তাহলে তা দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে প্রকৃত মজুদকে আরো বহু বছর ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক আলোচনা একই সাথে শঙ্কা ও সম্ভাবনার। রাষ্ট্রীয় মোট মজুদ এই মুহূর্তে কম হলেও চিন্তার তেমন কিছু নেই। এই মুহূর্তে গ্যাসের মোট মজুদ ১৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ২০০১ থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্যাসের উৎপাদন ছিল ৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের বেশি। উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ২০৩১ সাল পর্যন্ত চলবে এবং তখন চাহিদা হবে বছরে ২ বিলিয়ন ঘনফুট।

এমতাবস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে আগামী দিনের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হবার কোনো বিকল্প নেই। ২০০৯-এর পর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে ক্ষমতাসীন সরকার সম্ভাবনাময় সমুদ্রের ব্লকগুলোতে গ্যাস অনুসন্ধানে নিজস্ব সক্ষমতা বিকাশে নিষ্ক্রিয় থাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত অনেক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। ছক-৮ এ বিভিন্ন খাতে বর্তমানে উৎপাদিত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো।

যে কারণে বলা হয় আমাদের সমুদ্র সীমানায় প্রচুর গ্যাস আছে: মানচিত্রে তেল-গ্যাসসমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরের চারটি অববাহিকার অবস্থান দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি এই চারটি পাললিক অববাহিকার নাম হলো কৃষ্ণা-গোদাবরী, মহানন্দা, বাংলা এবং আরাকানি অববাহিকা। সমুদ্র সীমানার যে অংশটি নিষ্পত্তির কারণে দেশজুড়ে বিজয় উৎসব হলো, সেখানে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো তেল-গ্যাসের অনুসন্ধান হয়নি। একই ধরনের ভূতাত্ত্বিক গঠনযুক্ত বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রায় সকল জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, আমাদের সমুদ্র সীমানায় হাইড্রোকার্বনের বিশাল মজুদ এখনো অনাবিষ্কৃত। বাংলাদেশের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের ভারত সীমানায় কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় এখন পর্যন্ত ৫৫৭টি অনুসন্ধানী কূপ খনন করা হয়েছে। তার পূর্বে আমাদের বাংলা অববাহিকার ঠিক পশ্চিমে মহানন্দা অববাহিকায় ১০টির বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের সমুদ্র সীমানার পূর্ব দিকে মিয়ানমারের আরাকান অববাহিকায় বাংলাদেশের বর্তমান মোট মজুদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ আমাদের গভীর সমুদ্রে ২০টিসহ পুরো বাংলা অববাহিকায় এ পর্যন্ত অনুসন্ধানী কূপ খনন করা হয়েছে মাত্র ৭৯টি।

আমাদের দেশে ১৯৭০-এর দশকে কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু পরিমাণে কম এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলন লাভজনক হবে না বিধায় কোনো বিদেশি কোম্পানি উত্তোলনে আগ্রহ দেখায়নি। আবার আমাদের কোনো সরকারও সেই গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়নি। এরপর ১৯৯০-এর দশকে সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে নতুন করে আশার আলো দেখা যায়। যদিও সেখানে ০.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের পর দেখা গেল মজুদ শেষ। তারপর আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর কারণ হলো গত শতকের সত্তরের দশকে ভূতাত্ত্বিকরা এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে এখানে তেল-গ্যাসের উল্লেখযোগ্য

ছক-৭: মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল : নবায়নযোগ্য গ্যাসের উৎসসমূহের পরিমাণ

উপাদান	মিলিয়ন টন/বছর	গ্যাসের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)
গরু-মহিষের গোবর	৬০.২	১০৫
পোলট্রি খামারের বর্জ্য	২.০৫	৭.৮
পয়োবর্জ্য	৩২.৮৫	৪২.২

ছক-৮: বিভিন্ন খাতে গ্যাসে ব্যবহারের পরিমাণ

খাতের নাম	ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)	%
বিদ্যুৎ	৩৫৭	৪০
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৫২	১৭
শিল্প	১৫০	১৬.৮২
বাণিজ্য, চা ও অন্যান্য	৯	১
গার্হস্থ্য	১২৫	১৪
সার উৎপাদন	৫৪	৬
পরিবহন	৪৩	৫

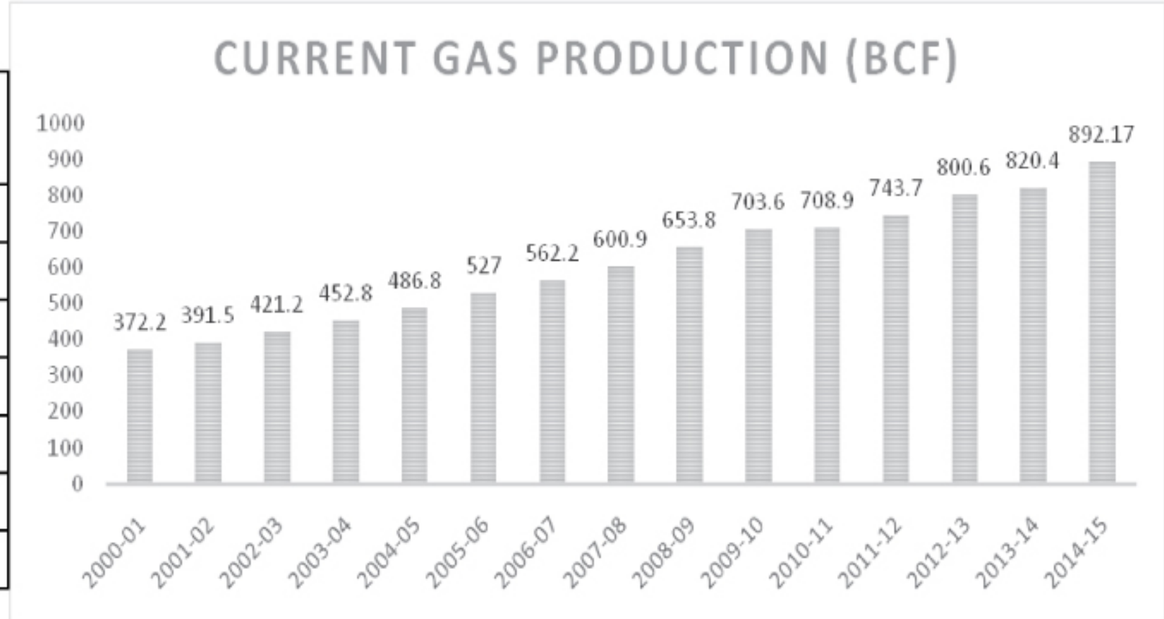

কোনো মজুদ নেই। কিন্তু ঠিক ৩০ বছর পর ভূতাত্ত্বিকরা ভিন্ন ধরনের তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ Turbidite Reservoir Model দিয়ে এ অঞ্চলের সম্ভাব্য তেল-গ্যাসের মজুদকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। এখানে বলা হয়, গতানুগতিক তেল-গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ তৈরি হবার জন্য মাটির অনেক গভীরে যে উচ্চ চাপ ও তাপ দরকার হয় (Thermogenic Process) বঙ্গোপসাগরের গ্যাসের মজুদ ঠিক এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়নি। এখানে অল্প গভীরতায় ব্যাকটেরিয়ার কারণে Biogenic Process-এর মাধ্যমে গ্যাসের বিপুল মজুদ তৈরি হয়েছে, যা গতানুগতিক তত্ত্ব ও ধারণার সাথে মেলে না।[৪]

নতুন ধরনের তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনুসন্ধান শুরু করার পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মিয়ানমার সীমানায় আরাকান অববাহিকায় ২০০৪ সালে কোরিয়ান দাইয়ু ৫ থেকে ৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের নিশ্চিত মজুদ আবিষ্কার করে। একই ধারাবাহিকতায় ভারত তার রাষ্ট্রীয় কোম্পানি ঙঘএঈ ও রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (RIL) সাহায্যে তার সীমানার গভীর সমুদ্রে বঙ্গোপসাগরের কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় প্রাথমিকভাবে ৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত উড়িষ্যা উপকূলে মহানন্দা অববাহিকায় ২০০৭ সালের পর ১০টির বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসের মজুদ খুঁজে পায়। এসব তত্ত্ব ও তথ্য নিশ্চিত করে যে গ্যাস আমাদের সমুদ্র সীমানায়ও আছে। কিন্তু তার পরিমাণ জানার জন্য

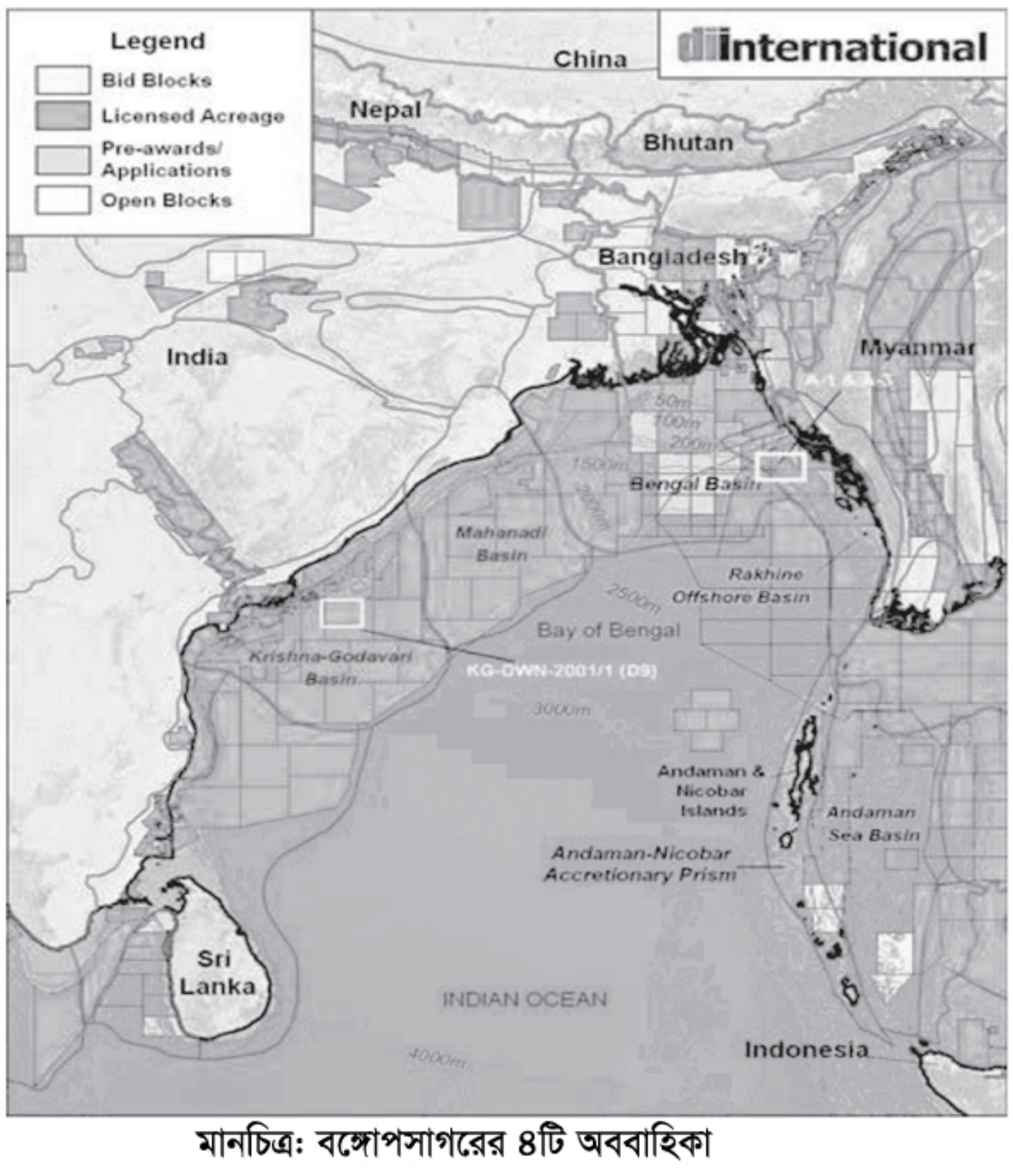

মানচিত্র: বঙ্গোপসাগরের ৪টি অববাহিকা

অপেক্ষা করতে হবে। এখানে বর্তমানের সমান বা তার চেয়ে বেশি মজুদ আবিষ্কৃত হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই লেখার শুরুতে বলা হয়েছিল, গ্যাসের আলোচনা শঙ্কার, আবার সম্ভাবনারও।

প্রসঙ্গ বাপেক্স: সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করার প্রসঙ্গ এলেই দেশের কিছু কোম্পানিমুখি জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও জ্বালানি সাংবাদিকরা সমস্বরে দাবি করেন যে আমাদের সক্ষমতা নেই। অবিলম্বে বিদেশি কোম্পানিদের আমন্ত্রণ জানানো হোক। বোধগম্য কারণেই এরা কেউ বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা কেউ বলেন না। এই সুযোগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী বিদেশি কোম্পানিগুলো বিদ্যমান পিএসসিতে গ্যাসের দাম বাড়ানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। ফলে ২০১২-এর মডেল পিএসসি পরিবর্তন করে গ্যাসের বাড়তি দাম এবং রপ্তানির বিধান রেখে আবারও বিদেশি কোম্পানিদের গ্যাস অনুসন্ধানের আমন্ত্রণ জানানো এবং চুক্তি করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এখানে বিপুল পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কৃত হবে খুব শিগগিরই। কিন্তু বিদেশি কোম্পানি উত্তোলন করলে আমাদের লাভ সামান্যই। গ্যাস আমাদের অমূল্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ। এই অমূল্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমাদের প্রয়োজন এবং সুবিধা অনুযায়ী আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিল্প ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে সুবিধাজনক দামে উত্তোলন আর ব্যবহার করতে পারলেই এর সর্বোত্তম ব্যবহার হবে; নয়তো নয়।

বাংলাদেশের ভূমিতে ও সমুদ্রে যে গ্যাস সম্পদ আছে তা দেশীয় সক্ষমতায় কূপ খনন, উত্তোলন, পরিবহন এবং গ্রাহকের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ না নিয়ে ক্রমাগত বলে যাওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনকারী কোম্পানি বাপেক্সের সক্ষমতা নেই। বাস্তবে স্থলভাগে বাপেক্সের ভালো সক্ষমতা আছে। বর্তমান জনবলের বাইরেও বাপেক্সের তৈরি করা অন্তত দেড় শতাধিক প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানিতে চুক্তিভিত্তিক শ্রম, মেধা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশেই কাজ করার আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এ ছাড়া উল্লেখ্য, বাপেক্সের ড্রিলিং রিগ আছে ৫টি। এত কিছুর পরও সক্ষমতা নেই– এই অজুহাতে সম্প্রতি স্থলভাগে রুশ কোম্পানি গ্যাসপ্রমকে শ্রিকাইল, বাখরাবাদ ও রশিদপুরের বেশ কয়েকটি কূপ খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং কূপ খননের প্রযুক্তি ও জনবল না থাকলেও তা তৈরি করা কঠিন নয়। তা না করে ক্রমাগত বাপেক্সের সক্ষমতা নেই বলে প্রচার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ গ্যাসকে বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে উত্তোলন করে উল্টো তাদের লাভ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত ছিল সব সরকার। বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় (৪৮ ডলার প্রতি ব্যারেল) তেলের তুলনায় বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন বহুজাতিক কোম্পানিদের কাছে কম লাভজনক। ফলে তারা বাংলাদেশ সীমানায় বঙ্গোপসাগরের গ্যাস ব্লকগুলোতে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করতে চাচ্ছে না। বর্তমানে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির দশ ভাগের এক

ভাগ দামে (২৫ টাকা/এমসিএফ) দেশের ৪০%-এর বেশি গ্যাস বাপেক্স উত্তোলন করে। যদিও দাম প্রায় তিন গুণ (৬৫ টাকা/এমসিএফ) করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও বাপেক্সের উত্তোলন করা গ্যাসের দাম হবে বহুজাতিক কোম্পানির বর্তমান প্রস্তাবিত মূল্যের আট ভাগের এক ভাগ। কারণ নতুন পিএসসিতে গ্যাসের দাম বর্তমানের ২৪০ টাকা/এমসিএফ থেকে বাড়িয়ে ৫২০ টাকা/এমসিএফ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

স্থলভূমিতে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য অতি সম্প্রতি বাপেক্স উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৫ বছরে ১০৮টি নতুন কূপে গ্যাস অনুসন্ধান করা হবে, যার ৫৩টি স্থলভাগে। বাপেক্স যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের রাস্তায় হাঁটলে সাধুবাদের দাবি রাখে। বাপেক্স প্রত্যাশা করছে, স্থলভাগের এসব অনুসন্ধানী কূপ থেকে ৫.৫ টিসিএফ নতুন গ্যাসের রিজার্ভ পাওয়া যাবে। বাপেক্সের করা টুডি ও থ্রিডি সাইসমিক সার্ভের ফলের ওপর ভিত্তি করে এই অনুসন্ধান ও প্রত্যাশা। এর সাথে সমুদ্রের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাময় গ্যাসের মজুদ যুক্ত হলে মোট রিজার্ভ দিয়ে আমরা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অনায়াসে চলতে পারি। এ বিষয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশিত কল্লোল মোস্তফার লেখাটি দেখা যেতে পারে।

গ্যাস সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি–

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন (৪০%), সার উৎপাদন (৬%), ক্যাপটিভ পাওয়ার (১৭%) শিল্প-কল-কারখানায় (১৭%) গ্যাস ব্যবহারের যান্ত্রিক দক্ষতা বাধ্যতামূলক করা হোক। তাতে বর্তমানের রিজার্ভ দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি না করেই বাড়তি আরো কয়েক বছর চলা যাবে।

২. মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট থেকে জৈব সার উৎপাদন করে কৃষকদের সরবরাহ করা হলে রাসায়নিক সারের চাহিদা ৫০% কমে যাবে। এতে একদিকে যেমন সার উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাস বেঁচে যাবে, অন্যদিকে দেশের মানুষ কিছুটা হলেও রাসায়নিকমুক্ত খাবার পাবে। কারণ জৈব সার দিয়ে জমির ঘাটতি উর্বরতা ৫০%, ক্ষেত্রবিশেষে আরো বেশি পূরণ করা যায়। প্রচুর নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং নদী বা খালের মোহনাগুলো হাইপক্সি জোন হবার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

৩. গ্যাসভিত্তিক প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের মাধ্যমে গ্যাস এফিসিয়েন্সি ৩৩% থেকে ৫৫%-এ উন্নীত করতে হবে। এই মুহূর্তে দেশের ১৮০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কম্বাইন্ড সাইকেলে চলে। অবশিষ্ট গ্যাসভিত্তিক ৩২৫০ মেগাওয়াটকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর করা হলে বর্তমানের ৫০৪০ মেগাওয়াটের জায়গায় সমপরিমাণ গ্যাস দিয়েই ৭১৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

৪. সকল শিল্প-কল-কারখানার অব্যবহৃত ছাদে গ্রিড টাই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দিনের ৫ ঘণ্টা গ্রিডে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এ ক্ষেত্রে শিল্প-কল-কারখানায় গ্রিড থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ থাকবে। কিন্তু তারা বাড়তি যে বিদ্যুৎ ছাদ থেকে উৎপাদন করবে তা বাণিজ্যিক ও গার্হস্থ্য সংযোগে সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুতের মোট চাহিদা উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয় ঘটাবে।

৫. ডেইরি, পোলট্রি, স্যুয়ারেজসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে প্রাকৃতিক মজুদের ওপর চাপ কমানো কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা অনেকাংশে দূর করা যাবে। উদাহরণ : থাইল্যান্ড।

৬. বাপেক্সকে আন্তর্জাতিক মানের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপদান করে স্থল ও জলভাগের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের স্বার্থে, দেশীয় চাহিদামতো অনুসন্ধান, উত্তোলন, সরবরাহ করলে গ্যাসের দাম না বাড়িয়ে, এলএনজি আমদানি না করে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ না রেখেই বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ সকল প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

ব্যাটারি

নবায়নযোগ্য শক্তির বর্ণনায় ব্যাটারি অথবা এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমের আলোচনা অপরিহার্য। কারণ নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে না। কখনো অনেক বেশি থাকে, আবার কখনো কম কিংবা থাকেই না। ফলে শক্তি সঞ্চয় করে পরে ব্যবহার করা গেলেই এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। বিশ্বজুড়ে ব্যাটারির সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করে ব্যবহার করার ফলে পুরো এনার্জি ইন্ডাস্ট্রিতে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। (আগামী পর্বে সমাপ্য)

মাহবুব সুমন: প্রকৌশলী ও গবেষক।
ইমেইল: mahbub.sumon@mail.com

তথ্যসূত্র:

১) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : MD Nazrul Islam [Sarkar Renewables (2016) 3:11 DOI 10.1186/s40807-016-0031-7], Assessment of Renewable Energy Resources of Bangladesh [http://shakti.hypermart.net/publications/ebook1.pd]

২) বিস্তারিত জানতে পাঠক নিচের লিংকগুলো দেখতে পারেন–
'Japan next-generation farmers cultivate crops and solar energy', Junko Movellan, Renewable Energy.world.com, 10 October 2013, http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/10/japan-next-generation-farmers-cultivate-agriculture-and-solar-energy?cmpid=WNL-Friday-October11-2013

Ho MW. Harvesting energy from sunlight with artificial photosynthesis. Science in Society 43, 43-45, 2009.

'Solar sharing' spreading among Fukushima farmers', The Japan News/ANN, 26 June 2013,http://news.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Asia/Story/A1Story20130626-432406.html

Ho MW. Renewable ousting fossil energy. Science in Society 60 (to appear).

http://www.abb.com/cawp/seitp202/a007d66995f2a5d9c1257b05003a0a23.aspx

৩)বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: www.nrel.gov/docs/fy12osti/54605.pdf

৪) দেখুন: Modeling of a Deepwater Turbidite Reservoir Conditional to Seismic Data Using Multiple-Point Geostatistics; Sebastien Strebelle and Karen Payrazyan, Chevron Texaco EPTC, and Jef Caers, Stanford University| The Reservoir Architecture of Turbidite Channels: Models and Mysteries, Tim McHargue, Article #51044, November 24, 2014| A Review of Hydrocarbon habitats in Bangladesh by Professor Badrul Imam, Mahbub Hasan, Journal of Petroleum Geology 25(1):31 - 52 • September 2006.